দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষার উচ্চতা

পরিশীলিত হৃদয় নয়। অকারণ ভাবাবেগ, অতিরিক্ত অন্যমনস্কতা বা উদাসীনতা- এরা হৃদয়ের অশিক্ষার লক্ষণ, অন্য কিছু নয়। প্লীহা রোগীর অতিকায় প্লীহা যেমন স্বাস্থ্যের প্রমাণ দেয় না, অকারণে উত্তেজিত বা অহেতুক অস্থির হৃদয় তেমনি দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন মানুষকে তার পুরাতন বন্ধন থেকে মুক্ত করা। যে হৃদয় পুষ্ট নয়, সে হৃদয় পুষ্ট করে শুধু বন্ধনকে। বন্ধন কিসের? বন্ধন কুসংস্কারের, অন্ধবিশ্বাসের, বন্ধনভয়ের। আবদ্ধ হৃদয় পঙ্গু হয়ে পড়ে, আপনা থেকেই। আশঙ্কা থাকে আবদ্ধ অবস্থাতেই তার স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে হঠাৎ একদিন। অশিক্ষিত হৃদয় অতিসহজে উত্তেজিত হয়- প্রচণ্ডরূপে। তার অশ্রুপাতে সৃজনের উপাদানেরা ভিজে ভিজে ওঠে, ফলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টিতে। অশিক্ষিত হৃদয় ক্রীড়নক হয়ে পড়ে অন্যের হাতের, প্রবল কোনো বায়ুপ্রবাহের আয়োজন ঘটলে সে মাথা নুইয়ে দেয়, এপাশে-ওপাশে। পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকাই যদি, পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের দিকেও- দেখবো কত সহজে প্রতারিত হয়েছে আমাদের হৃদয়, স্বীয়স্বার্থসিদ্ধকারী মানুষদের হাতে। হৃদয়কে তাই শক্ত হতে জানতে হবে, কোমল হতে জানার সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্য পরিবর্তনের দুর্বার ইচ্ছাশক্তির উৎসমুখ একটাই, শিক্ষিত হৃদয়। অশিক্ষার কর্দমে ক্ষতি আছে, লাভ নেই।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই, চাই ভাগ্য পরিবর্তনের বিপুল প্রবল উদ্যম, আর সেই জন্যই হৃদয়ের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চাই বুদ্ধির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, যাতে করে অনুভব ও ধারণা, আবেগ ও জ্ঞান, কল্পনা ও বুদ্ধি একত্র কাজ করতে পারে, যাতে করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুবর্ণ সংযোগে আমরা নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি সবল ও সমর্থ পদক্ষেপে। পানির প্রবল স্রোতকে বশ করে যেমন আমরা বিদ্যুৎশক্তি এনেছি, তেমনি করে আবেগ থেকে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা আনতে হবে, নইলে বন্যা আসবে দুর্গতিকে মাথায় নিয়ে।

তুকভিল আমেরিকার গণতন্ত্রের উপর তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় আলোচনার স্বাধীনতা যত ছিল, চিত্তের স্বাধীনতা তত ছিল না। আলোচনার স্বাধীনতা ও চিত্তের স্বাধীনতা এক বস্তু নয়। ঠিক তেমনি বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তি ও হৃদয়ের বয়ঃপ্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। বুদ্ধিতে পক্ক মানুষ আবেগের দুর্বলতায় শিশুর মতো আচরণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক রমোন্যাসের যন্ত্রদানবদের উদাহরণ নেয়া যায়। বুদ্ধিতে তারা টসটসে পাকা, কিন্তু যেহেতু হৃদয় নেই ভেতরে তাই তারা নিতান্তই অমানুষ। তুকভিল দেখিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক আমেরিকায় আমেরিকার সমালোচনা সহ্য করবার শক্তির অভাব ছিল, অথচ ফরাসী দেশের অভিজাত শ্রেণী তাদের নিজেদের উপর লেখা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক নাটক উপভোগ করতে পারতো অতিসহজে এবং এর কারণ এই যে, অভিজাত শ্রেণী অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল না হৃদয়ের দিক থেকে। উত্তেজনার মধ্যে ধৈর্য, ভয়ের মধ্যে সাহস, বিপর্যয়ের মধ্যে বিজ্ঞতা বজায় রাখার শিক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, বুদ্ধির নয়।

বয়ঃপ্রাপ্তির পরও আমাদের শৈশব অক্ষুণ্ন থাকবার আরো একটি প্রমাণ আছে, আছে স্বর্গকে পেছনে-দেখার রোগের মধ্যে। শিশু যেমন বার বার খেলা ফেলে কেঁদে ওঠে, কারণে-অকারণে আমরাও তেমনি ফিরে ফিরে যেতে চাই অতীতের স্বর্গে, শুধু যেতে চাই না একে অপরকে জোর প্ররোচনা দিই যাবার জন্য সেই গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছের পশ্চাদস্বর্গে। আমরা ঐতিহ্যের বড়াই করি, জাত্যাভিমানে বড় বড় ধ্বনি তুলি, আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করি। স্বর্গকে যদি দেখতেই হয় তবে দেখতে হবে সামনে, সেই স্বর্গকে যে স্বর্গ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না, যাকে তৈরি করে নিতে হয় স্বকীয় শ্রম ও স্বেদের বিনিময়ে।

আমরা ভাবছি আমাদের অভাব নেই হৃদয়ের, তাই হৃদয়ের অভাব আমাদের ঘুচতে চায় না। তাছাড়া হৃদয় যেটুকু আছে সেটুকুও যেহেতু অপরিশীলিত ও রুগ্ন তাই হৃদয়ের শিক্ষা প্রয়োজন বিশেষভাবে। আমরা কথায় বলি 'বিদ্যাবুদ্ধি', বুদ্ধির বিদ্যা তো দরকারই, তার চেয়েও বেশি দরকার আমাদের হৃদয়ের বিদ্যা। এই বিদ্যাদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক চাই।

একাত্তরের গণহত্যা যখন চলছিল প্রবল বিক্রমে তখন পাঞ্জাবী দস্যুদের সমর্থক লোকদের বলতে শুনেছি শিক্ষকরাই নাকি আসল শয়তান, তারাই ভুলে পথে চালিয়েছে ছাত্রদের, ভুল পথে অর্থ যথার্থ পথে। তাঁরা বলেছেন, বিজ্ঞানের শিক্ষকদের ওপর তত রাগ নেই সামরিক কর্তৃপক্ষের, যত আছে কলাশাস্ত্রের শিক্ষকদের ওপর। কেননা কলাবিভাগীয় শিক্ষকরা হট্টগোল করে বেশি, বড় বড় কথার তারাই প্রধান সওদাগর। অর্থাৎ কিনা তাঁরা বিবেকের কথা বলেন, তাঁরা পরিচর্যা করেন সংবেদনশীল হৃদয়ের। যদিও নিরীহ তাঁরা আপাত, জাগতিক-বিচারে-অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের পঠনপাঠনে লিপ্ত, তবু তাঁরাই, ঐ বাহুল্যেরই, ভীষণ শক্ত ভেতরে ভেতরে। এই কথাটা কোনো একজন মানুষের কথা নয়, এটা সব অত্যাচারী মানুষের ভয়ের কথা-আসলে।

কিন্তু শিক্ষকদের ঢালাই প্রশংসা খুবই অযথার্থ। শিক্ষকদের ভেতর দুষ্টবুদ্ধির লোকের অভাব ছিল না। বিশ্বদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে যত তাঁবেদার ছিলেন শতকরা হিসাবে অন্য কোনো ব্যবসায় কি পেশায় তত ছিল না বলেই মনে হয়। শিক্ষকরা ভুল তথ্য শিখিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শান্তি কমিটিতে নাম লিখিয়েছেন বিদ্যালয়ের বাইরে। যাঁরা তাঁবেদার ছিলেন না তারাও ভীত ছিলেন ভীষণভাবে। নিজেদের বিবেককে নিয়ে যাঁরা ভীত-বিহ্বল বিবেকের শিক্ষক হিসাবে তাঁরা অবশ্যই ব্যর্থ।

ব্যর্থতার একটা কারণ নিরাপত্তাবোধের অভাব। অন্য কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাঁদের অভাব যত তাঁর চেয়ে বেশি অভাববোধ। লোকের আস্থা নেই তাঁদের শিক্ষার প্রতি; তাঁরা শিক্ষা দেন সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা, বাইরে দেখা যায় অসৎপন্থীদের জয়জয়কার। তাঁদের নিজেদেরও আস্থা নেই নিজেদের ওপর। এমনকি যে ত্রুটিবহুল শিক্ষা তাঁরা প্রদান করেন সেই শিক্ষাব্যবস্থাতেও তাঁদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নেই। শিক্ষককে তাই তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে। শুধু শিক্ষাব্যবস্থাতে নয়, সমাজব্যবস্থাতেও। আমাদের সমাজে নেতৃত্ব ও মর্যাদা কাদের? আর যাদেরই হোক শিক্ষকদের নয়। শিক্ষককে সামাজিক নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে আনা আবশ্যক আজ বিশেষভাবে।

শিক্ষা তো শুধু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়, ব্যাপার পরিবার ও সমাজেরও। সমাজই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে সবকিছুকে। শিক্ষক যখন পড়াতে বাধ্য হন যে, রাজনীতি মহাপাপ, তখন দেখা যায় যে সমাজে কল্যাণকর পরিবর্তন যা আসছে তা ওই মহাপাপের পথ ধরেই। শিক্ষা ও সমাজের মাঝখানে ওই রকমের ফাঁক থাকলে সেই ফাঁকে শিক্ষাদানের সদুদ্দেশ্য তলিয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে আবার এও সত্য যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সমাজের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া আবশ্যক। সমাজ যদি মানুষে মানুষে অসাম্য শেখায় তাহলে বিদ্যালয়ে সাম্যের শিক্ষা পত্তনের আগে প্রয়োজন হবে সামাজিক কুশিক্ষার দুষ্ট চারা উপড়ে ফেলা। এটা একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। চারুকলা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে একবার তাঁর দায়িত্বের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ছাত্রদের আঁকতে শেখানোর আগে তাঁর কাজ হয় যে ভুল আঁকা তারা বাইরে থেকে শিখেছে সেটা ভুলতে শেখানো। এই দায়িত্বটা সকল শিক্ষকেরই। সমাজ প্রতিনিয়ত ভুল শিক্ষা দিচ্ছে, বিশেষ করে হৃদয়কে-শিক্ষা দিচ্ছে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, ভীতি।

আমরা বলি শিক্ষকরা আদর্শ নাগরিক তৈরি করবেন। কথাটার তাৎপর্য বিবেচনা করে দেখবার মতো। আদর্শ নাগরিক বলতে আমরা বুঝি যোগ্য, দক্ষ, প্রশংসাভাজন মানুষ। অর্থাৎ কিনা এমন মানুষ যার সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ বাঁধবে না, সমাজের ব্যবস্থাটাকে যে মেনে নেবে, মেনে নিয়ে খারাপ স্কুলের ভাল ছাত্রের মতো দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে। তাই এ কথা বলা দরকার যে এটা পর্যাপ্ত। নয়। আমরা শুধু আদর্শ নাগরিক চাই না, চাই উপযুক্ত মানুষও। (মানুষ কথাটা বাংলায় খুব চালু। আমরা বলি ভাল মানুষ, ছেলে মানুষ, বড় মানুষ, মেয়ে মানুষ। এই হাঁকডাকে বোঝা যায় মানুষের বড়ই অভাব এই দেশে। যখন বলি কাজের মানুষ- অর্থাৎ গৃহভৃত্য- তখন কাজের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না, পায় না শ্রমের তথাকথিত মর্যাদায় মর্যাদাবান হবার লোভ। এ কথা তর্কাতীত যে আমরা শ্রমবিমুখ। Result ও fruit- এর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না; দুটোই ফল, আপন স্বভাবে ফলেছে তারা, এখন আমাদের দায়িত্ব শুধু নিচ থেকে সন্তর্পণ কুড়িয়ে নেয়া।) মানুষের অভাব বলেই কেবল নাগরিকদের দিয়ে কাজ হবে না। এমন মানুষ চাই যার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সুশিক্ষা ঘটেছে হৃদয়ের, যার জ্ঞান আছে আর আছে প্রয়োজন হলে সাহস- একা দাঁড়াবার।

মস্তিষ্কের কথা, বুদ্ধির কথা অনেক শোনা গেছে, আরও শোনা যাবে, যাবেই; সেই জন্যই অবহেলিত ও অশিক্ষায় জর্জরিত হৃদয়ের কথা বলতে হবে, জোর দিয়ে। ●

শিক্ষা তো শুধু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়, ব্যাপার পরিবার ও সমাজেরও